বাংলাদেশে শিল্প সম্পর্ক
Industrial Relations in Bangladesh

৯

বাংলাদেশের শিল্প-সম্পর্কের প্রকৃতি ও পরিচয় সম্পর্কে এই ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে। এ দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শিল্প-সম্পর্কের অবস্থা, বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের বিধিবিধান ও বাস্তব অবস্থা ব্যবসায় প্রশাসনের শিক্ষার্থীদের জানা থাকা দরকার। এ লক্ষ্যে এই ইউনিটে বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ
এ ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ- ৯.১ : বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক: পরিচয় ও ভবিষ্যৎ	

পাঠ ৯.১ বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক : পরিচয় ও ভবিষ্যৎ
Industrial Relations in Bangladesh: Introduction and Future

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক উন্নয়নের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের জন্য দায়ী পক্ষগুলো সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের প্রস্তাবিত মডেল বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের ভবিষ্যৎ আলোচনা করতে পারবেন।

ব্যবসায় প্রশাসনের শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের প্রকৃতি ও পরিচয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি। এ দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ যে কোনো কার্য বিভাগে সফলতার সাথে কাজ করতে হলে শিল্প-সম্পর্কের বাংলাদেশের বিধিবিধান ও বাস্তব অবস্থা জানা থাকা দরকার। এ লক্ষ্যে এই পাঠে বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে আমরা বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করব।

বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের প্রকৃতি
Nature of Industrial Relations in Bangladesh

আমরা জানি, কোনো কিছুর প্রকৃতি বলতে তার অন্তর্নিহিত ধারণাগুলো বোঝায়; যেগুলো সামষ্টিকভাবে সে বিষয়ের ধারণা গঠন করে। এটিকে আবার বৈশিষ্ট্যাবলি বলা হয়। যাহোক, বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যাবলি হলো-

১। **বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক বহুপাক্ষিক আইন ও বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত:** বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও শিল্প-সম্পর্ক বহুপাক্ষিক আইন ও বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সরকার বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন-২০১৩, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫, শিশু শ্রম নিরসন নীতি-২০১০, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা-২০১২, গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন শ্রেণির নিম্নতম মজুরির হার আইন- ২০০৬, ইপিজেড শ্রমিকসংঘ ও শিল্প-সম্পর্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০০৭ প্রণয়ন করে বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়া, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিধিবিধান তো আছেই। পাশাপাশি শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সামষ্টিক পরিবেশের প্রভাব বিবেচনায় নেয়া দরকার হয়। এইভাবে বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উপাদানে গঠিত বহুপাক্ষিক আইন ও বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

২। **বাংলাদেশের শিল্প-সম্পর্ক রাজনৈতিক প্রভাবে দূষিত:** বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনগুলো কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। অধিকাংশ শ্রমিকসংঘ প্রধান রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ করে। ফলে, শ্রমিকসংঘগুলো শ্রমিক স্বার্থকেন্দ্রিক কাজ না করে রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করে বেশি। ফলে, আন্তঃদলীয় বিরোধ ও সংঘর্ষ হয়। তা ছাড়া, শ্রমিকসংঘের রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতার কারণে মালিকপক্ষ অস্বস্তিতে থাকে। সুষ্ঠু শিল্প-সম্পর্ক ব্যাহত হয়।

৩। **বাংলাদেশে প্রত্যাশিত মানের শিল্প-সম্পর্ক নেই:** বাংলাদেশে অধিকাংশ বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রম আইন মানা হয় না। সর্বনিম্ন মজুরি বাস্তবায়ন করা হয় না। অনিয়মিত মজুরি প্রদান করা হয়। নিয়োগ পত্র দেওয়া হয় না। যখন তখন বরখাস্ত করা হয়। বকেয়া পাওনা দেওয়া হয় না। শ্রমিকসংঘ করার অধিকার দেওয়া হয় না। তবে, বিদেশি ও

কয়েকটি বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে আইনানুগ ও প্রত্যাশিত মানের শিল্প-সম্পর্ক বজায় আছে। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের মান ভালো না।

৪। **বাংলাদেশে মালিকপক্ষ উত্তম শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখতে অনাগ্রহী:** বাংলাদেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অনেক মালিকগণ আদর্শিক, তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিকভাবে শিল্প-সম্পর্ক ধারণ ও লালন করতে অনাগ্রহী। তারা শ্রম আইন বাস্তবায়নেও তেমন উৎসাহী নয়। আর উত্তম শিল্প-সম্পর্কের কথা তো দূরের চিন্তা। কারণ হিসেবে মালিকদের উপযুক্ত শিক্ষা, মানসিকতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার অভাবকে দায়ী করা যায়। ভালো শিল্প-সম্পর্ক যে শেষ পর্যন্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানেরই আয় ও টিকে থাকার সক্ষমতা বাড়ায় এটি তারা বুঝতে চায় না।

৫। **বাংলাদেশে অনুন্নত শিল্প প্রেক্ষাপট শিল্প-সম্পর্ক উন্নয়নের বাধা:** বাংলাদেশ **১৯৭১** সালে স্বাধীনতা অর্জন করার পরেই ব্যাপকভাবে শিল্পায়ন শুরু হয়। ফলে শিল্পপতিদের শিল্প ব্যবস্থাপনার ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা কোনোটাই নেই। সে কারণে শিল্প-সম্পর্ক চর্চা করার প্রেক্ষাপট না থাকায় বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক ইতিবাচকভাবে উন্নতি লাভ করছে না। এ দেশের মানুষের সামন্ত মানসিকতাও শিল্প-সম্পর্ক উন্নয়নের পথে এক প্রবল প্রতিবন্ধক হয়ে আছে।

এবার বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের কারণসমূহ বর্ণনা করা হবে।

বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের কারণসমূহ

Causes of Poor Industrial Relations in Bangladesh

বাংলাদেশে **১৯৭১** সালে স্বাধীনতার পর থেকেই জোরদার শিল্পায়ন শুরু হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে শিল্প শ্রমিক ও শিল্প মালিকদের অভিজ্ঞতা বেশি দিনের নয়। সে কারণে বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক দুর্বল হওয়ার নানাবিধ কারণ আছে এবং সেগুলো হলো:

১। **মালিক ও শ্রমিক পারস্পরিক বিদ্বেষ:** ঐতিহাসিকভাবে মালিক ও শ্রমিকপক্ষ পরস্পরের চিরশত্রু। কেউ কারো বিশ্বাস করে না, আস্থাও করে না। উন্নত বিশ্বে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হওয়ায় এবং গণতন্ত্র ও কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ায় মালিক ও শ্রমিক পারস্পরিক বিদ্বেষ কমে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমাদের মতো দেশে এখনও শিল্প-গণতন্ত্রের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়নি। মালিকপক্ষ তাদের শোষণ ও নিপীড়নমূলক সামন্ত মানসিকতা ত্যাগ করতে পারেনি। শ্রমিকপক্ষও তাদের শোষিত ও অবহেলিত হওয়ার হতাশা ও শত্রুকে নিপাত করার যুদ্ধংদেহী মনোভাব ধরে রেখেছে। ফলে, মালিক ও শ্রমিকপক্ষের পারস্পরিক সন্দেহ, বিদ্বেষ ও বৈরি ভাবাপন্ন মনোভাবের কারণে বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক খারাপ অবস্থায় আছে।

২। **রাজনীতিকরণ:** বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্ক হওয়ার অন্যতম কারণ হলো শ্রমিকসংঘের রাজনীতিকরণ। শ্রমিকসংঘ শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ও কল্যাণ নিয়ে কাজ করবে এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু তারা যখন কোনো একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুগত হয় বা কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করে, তখন শ্রমিকসংঘ শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ও কল্যাণ বাদ দিয়ে ভিন্ন এজেন্ডা নিয়ে কাজ করে। বাংলাদেশে শ্রমিকসংঘ কোনো একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা চালিত হয় বা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করে। ফলে, তারা সেই রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ও নির্দেশ অনুসারে কাজ করে। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয় এবং এ কারণে মালিক বা ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখায় তাদের সহায়তা পায় না। ফলে, বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক দুর্বল।

৩। **শক্তিশালী শ্রমিকসংঘের অভাব:** বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক দুর্বল হওয়ার অন্যতম কারণ হলো এখানে শক্তিশালী শ্রমিকসংঘ নেই। শ্রমিকসংঘ প্রাতিষ্ঠানিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে গঠিত হয় ও কাজ করে। অধিক সংখ্যক শ্রমিক সদস্য সম্পন্ন শ্রমিকসংঘ কার্যকরভাবে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, মালিকপক্ষের সাথে জোরদারভাবে দরকষাকষি করতে পারে ও দাবি-দাওয়া আদায় করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে কোনো পর্যায়েই তেমন নেতৃত্বদানকারী শক্তিশালী শ্রমিকসংঘ নেই। শ্রমিকেরা রাজনৈতিকভাবে ও আঞ্চলিকভাবে বিভক্ত। ফলে, সকল শ্রমিকসংঘই দুর্বল। বাংলাদেশ আওয়ামী শ্রমিক লীগ বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা বড় শ্রমিকসংঘ। তা সত্ত্বেও সকল শ্রমিকের কাছে গ্রহণীয় কোনো কেন্দ্রীয় শ্রমিকসংঘ বা শ্রমিকসংঘ ফেডারেশন না থাকায় বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক দুর্বল অবস্থায় আছে।

৪। **শ্রমিকদের অনৈক্য:** বাংলাদেশের শ্রমিকেরা রাজনৈতিক মতানৈক্য ও আঞ্চলিকতার কারণে বিভক্ত। এ কারণে তারা পারস্পরিক ও আন্তঃইউনিয়ন দ্বন্দ্বে নিয়োজিত। এ ছাড়া, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে নেতারা দলাদলিতে জড়িত। শ্রমিকদের মধ্যে এই অনৈক্য বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক দুর্বল হওয়ার অন্যতম একটি কারণ।

৫। **মালিকপক্ষের স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা:** শিল্প-সম্পর্ক শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে ভালো থাকে। বাংলাদেশে শিল্পকারখানা নব্য ধনীক শ্রেণীর অধীন। মালিকেরা সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার মূল্যবোধ দ্বারা চালিত। ফলে, মালিকপক্ষ স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা পরিত্যাগ করতে পারেনি। এ কারণে তারা শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পছন্দ করে ও শ্রমিকদের মতামতের কোনো মূল্য দেয় না। ফলে, উভয়পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয় না। এজন্য, বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক দুর্বল।

৬। **ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্বাবধান:** শিল্প প্রতিষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়কগণ শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে সরাসরি মিথস্ক্রিয়া করে থাকে। এ কারণে তত্ত্বাবধায়কদের আচরণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শ্রমিক-কর্মচারীদের অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভের কারণ হয় এবং শিল্প-সম্পর্ক নষ্ট করে।। বাংলাদেশে শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে তত্ত্বাবধায়কগণের আচরণে অদক্ষতা, অসহিষ্ণুতা, ন্যায্যতার অভাব ও অমানবিকতা লক্ষ্য করা যায়। এই ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্বাবধান ও তত্ত্বাবধায়কদের অগ্রহণযোগ্য আচরণ বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক দুর্বল হওয়ার অন্যতম কারণ।

৭। **শ্রমিকদের শিক্ষার অভাব:** বাংলাদেশে অধিকাংশ শ্রমিক স্বল্প শিক্ষিত। এ কারণে শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা বিধি, পরিবেশগত অবস্থা ও সাংগঠনিক আদবকায়দা ভালোভাবে জানা ও মেনে চলার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা দেয়। তাছাড়া, তাদের অজ্ঞতা ও অনীহাকে ব্যবহার করে মতলববাজ মালিক ও শ্রমিকনেতারা ক্ষমতার অপব্যবহার ও শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী কাজ করে পরিবেশ উত্তপ্ত করে। ফলে, শ্রমিকদের অজ্ঞতাতেই শিল্প-সম্পর্ক নষ্ট হয়। এ কারণে বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের জন্য শ্রমিকদের শিক্ষার অভাবকে অন্যতম কারণ বলা হয়।

৮। **অপর্যাপ্ত মজুরি:** বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক দুর্বল হওয়ার অন্যতম কারণ হলো অপর্যাপ্ত মজুরি। বাংলাদেশে বর্তমানে সরকার কতিপয় শিল্পের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন: তৈরি পোশাক শিল্পসহ সরকারি সংস্থাসমূহের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, এখনও অনেক শিল্প বিশেষ করে সবচেয়ে বড় কৃষি খাতে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়নি। তা ছাড়া, নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি নিয়েও ব্যাপক অসন্তোষ আছে। এ সকল কারণে শ্রমিক-কর্মচারীদের অপর্যাপ্ত মজুরিকে বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক দুর্বল হওয়ার অন্যতম শক্তিশালী কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৯। **চাকুরির নিরাপত্তাহীনতা:** বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীরা ব্যাপকভাবে চাকুরির নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কোনো নিয়োগ পত্রই দেওয়া হয় না। ফলে, তারা কথায় কথায় কোনো রকম সুবিধা ছাড়াই চাকুরিচ্যুতির শিকার হয়। এ ছাড়া, চাকুরির নিরাপত্তা না থাকায় শ্রমিক-কর্মচারীরা মানসিকভাবে আতঙ্ক, হতাশা ও বিষন্নতায় ভোগে। ফলে, ব্যবস্থাপনার সাথে তাদের আচরণও অস্থির ও নেতিবাচক হয়। এ জন্য চাকুরির নিরাপত্তাহীনতাও তদ্জনিত অন্যান্য কারণে বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক দুর্বল।

১০। **অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা:** বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের আর একটি অন্যতম কারণ হলো অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা। বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩-তে কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে তার নির্দেশনা আছে (ধারা-৫১ থেকে ৯৯)। যদিও আইনগত এই সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো দরকার, তথাপিও এই নির্দেশনা অনুসারে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয় না। ফলে, শ্রমিক-কর্মচারীরা সংক্ষুব্ধ থাকে এবং শিল্প-সম্পর্ক দুর্বল হয়।

১১। **অস্বাস্থ্যকর কার্যপরিবেশ:** বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের আর একটি অন্যতম কারণ হলো অস্বাস্থ্যকর কার্যপরিবেশ। বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩ -তে কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কী ধরনের স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকতে হবে তার চমৎকার নির্দেশনা আছে। তবে, অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে তা মান্য করা হয় না। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে এবং অনেক বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে অস্বাস্থ্যকর কার্যপরিবেশ রয়েছে। এ কারণে শ্রমিক ও মালিক বিরোধ লেগেই থাকে এবং শিল্প-সম্পর্কের উন্নতি না হয়ে অবনতি হয়।

১২। **মালিকপক্ষের অসৎ শ্রম আচরণঃ** বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩ -তে মালিকের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণ (ধারা- ১৯৫) সম্পর্কে কতকগুলো কাজ নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা আছে। এই কাজগুলো মালিক বা ব্যবস্থাপনা করলে শ্রমিকেরা ক্ষিপ্ত ও অসন্তুষ্ট হয় ও শিল্প-বিরোধ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে, শিল্প-সম্পর্ক খারাপ হয়। কিন্তু বাংলাদেশে হরহামেশা মালিকপক্ষকে অসৎ শ্রম আচরণ করতে দেখা যায়। মালিকপক্ষ বা ব্যবস্থাপনা অনেকটা জোরপূর্বক এ দিক নির্দেশনাগুলো পাত্তা দেয় না। এজন্য মালিকের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণকে বাংলাদেশের দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মালিকের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণসমূহ আপনাদের অবগতির জন্য নিচে দেওয়া হলো-

কোনো মালিক বা মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন অথবা তাদের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি-

[ক] কোনো চাকুরি চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের কোনো ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান করা অথবা কোনো ট্রেড ইউনিয়নে তাঁর সদস্যপদ চালু রাখার অধিকারের উপর বাঁধা সম্বলিত কোনো শর্ত আরোপ করতে পারবে না;

[খ] কোনো শ্রমিক কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা আছেন অথবা নহেন, এই অজুহাতে তাঁকে চাকুরিতে নিয়োজিত করতে অথবা নিয়োজিত রাখতে অস্বীকার করবেন না;

[গ] কোনো শ্রমিক কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা আছেন অথবা নহেন-এই অজুহাতে তাঁর চাকুরিতে নিযুক্তি, পদোন্নতি, চাকুরির শর্তাবলি অথবা কাজের শর্তাবলি সম্মন্ধে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো বৈষম্য করবেন না;

[ঘ] কোনো শ্রমিক কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা আছেন অথবা হতে চান, অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে উক্তরূপ সদস্য বা কর্মকর্তা হওয়ার জন্য প্ররোচিত করেন, এই কারণে অথবা কোনো ট্রেড ইউনিয়নের গঠন, কার্যকলাপ ও এর প্রসারে অংশগ্রহণ করেন- -এই কারণে তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত, ডিসচার্জ অথবা অপসারণ করা যাবে না বা তা করার জন্য ভয় প্রদর্শন করা যাবে না , অথবা তাঁর চাকুরির কোনো প্রকার ক্ষতি করার হুমকি দেওয়া যাবে না;

[ঙ] কোনো শ্রমিককে বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো সুযোগ দিয়ে বা সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করা অথবা তাঁর জন্য সুযোগ সংগ্রহ করা অথবা সংগ্রহ করার প্রস্তাব দিয়ে তাকে কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হতে বিরত রাখার জন্য অথবা উক্ত পদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করবেন না;

[চ] ভীতি প্রদর্শন, বল প্রয়োগ, চাপ প্রয়োগ, হুমকি প্রদর্শন, কোনো স্থানে আটক, শারীরিক আঘাত, পানি, শক্তি এবং টেলিফোন সুবিধা বিচ্ছিন্ন করে অথবা অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করে কোনো যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি কর্মকর্তাকে কোনো চুক্তিতে উপনীত হওয়ার অথবা নিষ্পত্তিনামায় দস্তখত করার জন্য বাধ্য করবেন না বা বাধ্য করার চেষ্টা করবেন না;

[ছ] ধারা ২০২ এর অধীন কোনো নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করবেন না অথবা কোনোভাবে এটি প্রভাবিত করবেন না;

[জ] ধারা ২১১ এর অধীনে কোনো ধর্মঘট চলাকালে অথবা অবৈধ নয় এরূপ কোনো ধর্মঘট চলা কালে, কোনো নতুন শ্রমিক নিয়োগ করবেন না, তবে সালিস যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ কর্ম বিরতির কারণে এর যন্ত্রপাতি অথবা অন্য কোনো স্থাপনার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা আছে তা হলে তিনি, প্রতিষ্ঠানের যে বিভাগে বা শাখায় অনুরূপ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে সীমিত সংখ্যক অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের অনুমতি দিতে পারবেন;

[ঝ] অংশগ্রহণকারী কমিটির কোনো সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হবেন না;

[ঞ] কোনো শিল্প-বিরোধ সম্পর্কে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো পত্রের উত্তর দিতে ব্যর্থ হবেন না;

[ট] ধারা ১৮৭ এর বিধান ভংগ করে কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক অথবা কোষাধ্যক্ষকে বদলি করবেন না; অথবা

[ঠ] কোনো বেআইনী লকআউট শুরু করবেন না বা চালু রাখবেন না অথবা এতে অংশগ্রহণের জন্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচিত করবেন না।

১৩। **মুক্ত যোগাযোগের অভাব:** বাংলাদেশে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা দূরত্ব বজায় আছে। ফলে, তাদের মধ্যে মুক্ত যোগাযোগ হয় না। পারস্পরিক সমস্যার আদান-প্রদান কম হয়। ফলে, অভিযোগ জনিত ক্ষোভ প্রকাশিত না হওয়ার কারণে পুঞ্জীভূত হয় এবং শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সম্পর্ক ভালো না হয়ে খারাপ হয়। এ কারণে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে মুক্ত যোগাযোগের অভাব থাকায় বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক এত দুর্বল।

১৪। **মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির অভাব:** বাংলাদেশে মালিক বা ব্যবস্থাপনার মধ্যে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি সম্মানজনক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ মানবীয় ভাবনার অভাব আছে। তাদেরকে উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবেই মনে করা হয়। শ্রমিকশ্রেণির প্রতি মালিকপক্ষের এই অযৌক্তিক মনোভাবকে বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

১৫। **শ্রমিক নেতৃত্বের স্বার্থপরতা ও দুর্বলতা:** বাংলাদেশে শ্রমিকসংঘের নেতাদের মধ্যে নেতৃত্বে গুণাবলির অভাব রয়েছে। তা ছাড়া, তারা সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থ দ্বারা চলিত হয় ও তারা দুর্নীতিগ্রস্ত। ফলে, তারা শ্রমিকদের স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধার জন্য জোরালোভাবে কাজ করে না। শ্রমিক নেতৃত্বের স্বার্থপরতা ও দুর্বলতা বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এবার বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক উন্নয়নের উপায়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক উন্নয়নের উপায়সমূহ

Measures for Improving Industrial Relations in Bangladesh

বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক উন্নয়নের বহুবিধ উপায় আছে। কেননা, শিল্প-সম্পর্ক একটি বহুমাত্রিক বিষয়। এই বিষয়টি কোনো একক উপায়ে অর্জন করা যায় না। বহুমুখী উপায় সম্মিলিত আকারে ব্যবহার করতে হবে। যাহোক, নিচে বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক উন্নয়নের উপায়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হলো-

১। **মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন:** শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের কর্মী মনে না করে মানব সম্পদ মনে করে তাদেরকে আর্থসামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে নরম পন্থায় তাদের ত্রিমাত্রিক সত্ত্বার স্বীকৃতি ও বিকাশ করার ব্যবস্থাপনার নাম মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা। মারমার কাটকাট না করে উত্তম মানব সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে মানুষকে অনুপ্রাণিত ও চালিত করতে পারলে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সৌহার্দ্যমূলক শিল্প-সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ উপায় হলো মালিকপক্ষ প্রতিষ্ঠানে নরম পন্থার মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা দর্শন গ্রহণ করবে, চালু করবে ও অনুশীলন করবে। তা হলে বাংলাদেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে শক্তিশালী শিল্প-সম্পর্ক বজায় থাকবে।

২। **সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও নীতিমালা প্রণয়ন ও অবহিতকরণ:** আমরা জানি শিল্প-সম্পর্ক হলো শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার শাস্ত্রীয় জ্ঞান। এই পক্ষগুলো হচ্ছে ব্যক্তি শ্রমিক, শ্রমিকসংঘ, মালিক, মালিক সমিতি ও সরকার। এই সম্পর্কের উপাদানগুলো সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যাবলি পরিষ্কারভাবে লিখিত হতে হবে। একই সঙ্গে এই উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের জন্য প্রয়োজনী পদ্ধতি, নীতি, বিধিবিধান, প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট আকারে তৈরি করতে হবে। এবং এ সকল বিষয় শ্রমিক-কর্মচারীদের অবহিত করতে হবে। এ সকল বিষয় ভালোভাবে জানা থাকলে ভুল বোঝাবুঝি থাকে না ও শিল্প-সম্পর্ক ভালো থাকে।

৩। **ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকরণ:** বাংলাদেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি যেমন: শ্রমিক নির্বাচন, পদোন্নতি, কর্মচ্যুতি, বদলি, প্রশিক্ষণ, শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট বৈষম্যহীন নীতিমালার ভিত্তিতে পক্ষপাতহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করলে শ্রম অশান্তি হবে না। ফলে, বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক ভালো থাকবে ও উন্নত হবে।

৪। **শিল্প-গণতন্ত্র প্রবর্তনকরণ:** শিল্প-গণতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা যা প্রতিষ্ঠানে একটি সৌহার্দ্যমূলক ও স্বতঃস্ফূর্ত কার্যপরিবেশ সৃষ্টি করে, শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অংশীদার করে এবং তাদের স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করে। ফলে, শ্রমিকরা মালিক বা ব্যবস্থাপনার সাথে একাত্মতা বোধ করে ও প্রতিষ্ঠানকে নিজের বলে মনে করে। এ কারণে বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শিল্প-গণতন্ত্র প্রবর্তন করলে শিল্পে গণতান্ত্রিক ও মানবীয় পরিবেশ বজায় থাকবে, মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে ও শক্তিশালী শিল্প-সম্পর্ক বজায় থাকবে।

৫। **অভিযোগ নিষ্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ:** অভিযোগ পরিচালনা ও নিষ্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কোনো শ্রমিক কর্মচারীর কোনো অভিযোগ থাকলে তা কীভাবে কাকে জানাবে, কার কাছ থেকে কোনো ধরনের অভিযোগের প্রতিকার পাবে, কত দিনের মধ্যে প্রতিকার পাবে, অভিযোগ পরিচালনার প্রক্রিয়া কী হবে ইত্যাদি স্পষ্ট করে লিখিত আকারে থাকতে হবে। সর্বোপরি, স্বাভাবিক ন্যায়বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। এ বিষয়ে অভিযোগ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩ এর ধারা-৩৩ -এ বর্ণিত বিধি মেনে চলতে হবে। ফলে, প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক অসন্তোষ থাকবে না এবং বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক উন্নত হবে।

৬। **সন্তোষজনক মজুরি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন:** বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক উন্নয়ন করার একটি কার্যকর উপায় হলো শ্রমিকদের ন্যায্য ও সন্তোষজনক মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা। যে কোনো দেশে শিল্প-সম্পর্ক ভালো করার শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে উপযুক্ত মজুরি ব্যবস্থা। বর্তমানে বাংলাদেশে শ্রমিকদের মজুরি খুবই অপ্রতুল। সে কারণে শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন সন্তোষজনক মজুরি ও ভাতা ব্যবস্থা চালু করলে বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক উন্নত হবে।

৭। **মানবিক ও নিয়মতান্ত্রিক তত্ত্বাবধানকরণ :** শ্রমিক-কর্মচারীরা তত্ত্বাবধায়কদের সাথে প্রত্যক্ষ মিথস্ক্রিয়া করে বলে তাদের আচরণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শ্রমিক-কর্মচারীদের অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভের কারণ হয় এবং শিল্প-সম্পর্ক নষ্ট করে। বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়কদের স্বৈরতান্ত্রিক ও অযৌক্তিক আচরণের কারণে প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে এমন নজির ভুরিভুরি আছে। সে কারণে তত্ত্বাবধায়কদের আচরণ যদি মানবিক ও নিয়মতান্ত্রিক হয় ও তাদের তত্ত্বাবধান যদি সহায়তামূলক ও নিরপেক্ষ হয়, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক উন্নত হবে। এ জন্য প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়ককে মানবিক ব্যবস্থাপনার উপর যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৮। **সন্তোষজনক কার্যপরিবেশ প্রতিষ্ঠাকরণ:** কার্যক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ ও আরামপ্রদ কার্যপরিবেশ উত্তম শিল্প-সম্পর্কের পূর্বশর্ত। বাংলাদেশে অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রত্যাশিত কার্যপরিবেশ নেই। এমন কি বাংলাদেশ শ্রম আইনে নির্ধারিত কার্যপরিবেশও মানা হয় না। ফলে, অসন্তোষ লেগেই থাকে। এ জন্য বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের উন্নতি করতে হলে সন্তোষজনক কার্যপরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৯। **বৈষম্যহীন শৃঙ্খলা ও অভিযোগ পরিচালনা বিধির নিরপেক্ষ বাস্তবায়ন:** সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানেই নিজস্ব শৃঙ্খলা বিধি থাকে। পাশাপাশি অভিযোগ পরিচালনার বিধিবিধান থাকে। তা ছাড়া, বাংলাদেশ শ্রম আইনেও কিছু শৃঙ্খলা ও অভিযোগ পরিচালনার বিধি দেওয়া আছে। শৃঙ্খলা ও অভিযোগ পরিচালনা বিধি অবশ্যই বৈষম্যহীন ও বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। পক্ষপাতদুষ্ট শৃঙ্খলা ও অভিযোগ পরিচালনা বিধি উত্তেজনা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে অনেক প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত শৃঙ্খলা ও অভিযোগ পরিচালনা বিধির অভাব আছে এবং এ ক্ষেত্রে মালিকপক্ষের স্বেচ্ছাচার চলে। এ জন্য বৈষম্যহীন শৃঙ্খলা ও অভিযোগ পরিচালনা বিধি প্রণয়ন ও তার নিরপেক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করলে বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের উন্নতি হবে।

১০। **উপযুক্ত শ্রমিক নেতৃত্ব গড়ে তোলায় সহায়তাকরণ:** উপযুক্ত শ্রমিক নেতৃত্ব বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের উন্নতির জন্য খুবই দরকার। পাশাপাশি শক্তিশালী শ্রমিকসংঘ দরকার। বাংলাদেশে এ দুইটি বিষয় খুবই দুর্বল। এ জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নেতৃত্ব, শিল্প-সম্পর্ক, সাংগঠনিক সংস্কৃতি, ব্যবস্থাপনা, প্রেষণা ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে শ্রমিকদের বিশেষ করে শ্রমিকসংঘের নেতাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। ফলে, উপযুক্ত শ্রমিক নেতৃত্ব যেমন গড়ে উঠবে, তেমনই শক্তিশালী শ্রমিকসংঘ গড়ে উঠবে। ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের উন্নতি হবে।

১১। **মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে খোলামেলা যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনকরণ:** মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে মুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পারস্পরিকভাবের আদান-প্রদানে সহায়তা করে, উভয়পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক সৌহার্দ্যমূলক করে ও ভুল বোঝাবুঝি হ্রাস করে। কিন্তু বাংলাদেশে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে এই মুক্ত যোগাযোগ নেই বললেই চলে। সে কারণে শিল্প-সম্পর্কও মধুর নয়। এ ক্ষেত্রে ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তা হলে যোগাযোগ হবে স্বচ্ছ ও দ্রুত। এ জন্য শিল্প-সম্পর্কের উন্নতি করতে হলে প্রতিষ্ঠানে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে খোলামেলা ও ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

১২। **শ্রমিক কল্যাণ সুবিধা বাস্তবায়ন:** উত্তম শিল্প-সম্পর্কের জন্য প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা একটা শক্তিশালী হাতিয়ার। যেমনঃ চিকিৎসা, বাসস্থান, যাতায়াতের জন্য গাড়ি বা ভাতা, ক্যান্টিন, শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করলে শ্রমিকরা নিরাপদ ও সন্তুষ্ট থাকে। বাংলাদেশে এ সকল শ্রমিক কল্যাণ সুবিধা বাস্তবায়ন করলে শিল্প-সম্পর্কের উন্নতি হবে।

এবার বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের জন্য দায়ী পক্ষগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের জন্য দায়ী পক্ষগুলো

Parties Responsible for Poor Industrial Relations in Bangladesh

বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের জন্য দায়ী পক্ষগুলো হলো মালিক, শ্রমিক, সরকার ও আর্থসামাজিক অবস্থা। এগুলো কীভাবে বাংলাদেশের শিল্প-সম্পর্ককে দুর্বল করে রেখেছে তার একটা চিত্র নিচে বর্ণনা করা হলো -

১। **মালিকপক্ষ:** বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের জন্য দায়ী পক্ষগুলোর মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকপক্ষ প্রধানতঃ দায়ী। শিল্পে সুষ্ঠু কার্যপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রবর্তন করা ও নিশ্চিত করা মালিকের দায়িত্ব। দেশের আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেয়াও মালিকের দায়িত্ব। বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩ এ বর্ণিত নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলি (ধারা ৩-৩৩), কিশোর শ্রমিক নিয়োগ (ধারা ৩৪-৪৪), প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা (ধারা ৪৩-৫০), স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা (ধারা ৫১-৬০), নিরাপত্তা বিধি (ধারা ৬১-৭৮), কল্যাণমূলক ব্যবস্থা (ধারা ৮৯-৯৯), কার্যঘন্টা (ধারা ১০০-১১৯), মজুরি ও উহার পরিশোধ (ধারা ১২০-১৩৭), দূর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের কাষতিপূরণ (ধারা ১৫০-১৭৪), ট্রেড ইউনিয়ন এবং শিল্প-সম্পর্ক অংশগ্রহণকারী কমিটি (ধারা ১৭৫-২০৮), বিরোধ নিষ্পত্তি (ধারা ২০৯-২৩১), কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ (ধারা ২৩২-২৫২), ভবিষ্যৎ তহবিল (ধারা ২৬৪-২৭৩), অপরাধ, দন্ড এবং পদ্ধতি (ধারা ২৮৩-৩১৬) ইত্যাদি বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা মালিকপক্ষের দায়িত্ব। কিন্তু অনেক মালিক তা প্রতিপালন করে না। এ সবের বাইরেও পরিবর্তিত অবস্থায় মালিকপক্ষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিছু স্বেচ্ছামূলক সহায়ক ও কল্যাণমূলক কাজ করতে পারে। তা ছাড়া, নাগরিক হিসেবে একজন শ্রমিকের যে সাংবিধানিক অধিকার আছে, আদালত কর্তৃক ঘোষিত যে অধিকার আছে, সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার নির্দেশিত যে অধিকার আছে তা প্রতিপালন করা মালিকপক্ষের দায়িত্ব। যাহোক, মালিকপক্ষ যথাযথভাবে এ সকল আইন নির্দেশিত বা স্বেচ্ছামূলক কাজ না করার কারণে বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়।

২। **শ্রমিকপক্ষ:** শিল্প-সম্পর্কের আর একটি পক্ষ হলো শ্রমিকপক্ষ; যারা বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের জন্য দায়ী। শ্রমিকপক্ষ আইন সংক্রান্ত বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে, তাদের অশিক্ষার কারণে, সামাজিক অবস্থানের কারণে ও সংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার কারণে শিল্প-সম্পর্ক ভালো রাখায় অবদান রাখতে পারে না। বরং শিল্প-সম্পর্ক নষ্ট করার নিয়ামক শক্তি হয়। মাঝেমাঝে তারা হুটহাট করে ধর্মঘট করে। তাছাড়া, শ্রমিকেরা আঞ্চলিকতা ও অপরাজনীতির শিকার। শ্রমিক নেতারাও অনেকসময় ব্যক্তি স্বার্থ ও দুর্নীতিতে নিয়োজিত। তারা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজেদের স্বার্থ অর্জনে ব্যস্ত। তবে ভালো ও নিঃস্বার্থ শ্রমিকনেতাও আছে এবং তারা ভালো শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে। যাহোক, সামগ্রিক বিচারে বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের জন্য শ্রমিকপক্ষ দায়ী আছে।

৩। **সরকার পক্ষ:** সরকার দেশের শিল্পায়ন ও শান্তিপূর্ণ উৎপাদন ধারা বজায় রাখার জন্য সামষ্টিক দায়িত্ব পালন করে। সরকার দেশে শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যবস্থা প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের মূল চালিকা শক্তি। সরকার সংসদে এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন না করলে বা নির্বাহী আদেশ জারি না করলে একটা দেশে শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখা যায় না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে প্রাথমিক যুগে শিল্পের মালিকরা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করত। সরকার তাদের অর্থনৈতিক ও উৎপাদন কাজে কোনো হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকত। কিন্তু তাদের স্বেচ্ছাচার দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানে অরাজকতা সৃষ্টি করে। শ্রমিকরা বিক্ষোভে ও বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। তখন বাধ্য হয়ে সরকার আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে শিল্পে শান্তি ফিরিয়ে আনে।

তা ছাড়া, মানুষের মৌলিক অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের আবশ্যিক কর্তব্য। এ প্রেক্ষিতে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এবং আইন প্রণয়ন করে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকদের শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখার

কার্যক্রম গ্রহণে বাধ্য করতে হবে। পৃথিবীর সবদেশে সরকার আইন করে এই শিল্প-সম্পর্ক কার্যক্রম চালু করেছে। বাংলাদেশ সরকারও বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩ প্রণয়ন করে দেশে শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তবে, অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান সেগুলো মানে না বা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করে না। এক্ষেত্রে সরকার তাদেরকে আইন প্রতিপালনে বাধ্য করবে। যাহোক, সার্বিক বিচারে শীর্ষ দায়িত্ব হিসেবে বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের জন্য সরকার পক্ষ দায়ী।

৪। **আর্থসামাজিক অবস্থা:** বাংলাদেশ অর্থনৈতিক বিচারে বর্তমানে মধ্যম আয়ের দেশ। মাথাপিছু আয় ২০৬৫ মার্কিন ডলার। কিন্তু ১২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। প্রায় ৬৮ লক্ষ কর্মক্ষম লোক বেকার (২০১৯)। সামাজিকভাবে বাংলাদেশে সামন্ত সমাজ বিদ্যমান আছে। বাংলাদেশ সামন্ত সমাজ থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বর্তমানে বাংলাদেশ এই রূপান্তর পর্যায়ে অবস্থান করছে। অন্যভাবে বলা যায়, বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে শিল্পভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তর হওয়ার পর্যায় অতিক্রম করছে। ফলে, লুটেরা নব্য ধনিকশ্রেণির দৌরাত্ম বেশি। ঘুষ, দুর্নীতি, মুনাফাখোরি, মজুতদারি, কালোবাজারি, ভূমি দখল ইত্যাদি রকম অনাচারের দাপট বেশি। বাংলাদেশে মালিক ও শ্রমিকশ্রেণি এই পশ্চাৎপদ ও দুর্নীতিগ্রস্ত আর্থসামাজিক অবস্থা থেকে আগত। ফলে, তাদের মূল্যবোধ ও মনমানসিকতা উদার গণতান্ত্রিক নয়। সামন্ত প্রভুর মানসিকতা ধারণ করে, কর্তৃত্বপরায়ণ হয়, মানবিকতাকে থোড়াই কেয়ার করে ও নিজের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। এই মানসিকতা মালিক ও শ্রমিক উভয়পক্ষই ধারন করে ও লালন করে। এমন প্রেক্ষাপটে শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখার মতো উদারনৈতিক, গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবিক সংস্কৃতির চর্চা ব্যাহত হবেই। হঠাৎ করে সামাজিক ও সংস্কৃতিক অবস্থা পরিবর্তিত হয় না। এটি বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে সময় নিয়ে পরিবর্তিত হয়। তবে, রাজনৈতিক - আইনগত পরিবেশের পরিবর্তন করে শিল্প-সম্পর্ক কিছুটা হলেও এগিয়ে নেওয়া যায়। পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের জন্য এ দেশের আর্থসামাজিক অবস্থাও দায়ী।

এবার আমরা বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের প্রস্তাবিত মডেলসম্পর্কে আলোচনা করব।

বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের প্রস্তাবিত মডেল

Proposed Model of Industrial Relations in Bangladesh

বাংলাদেশে সামন্ত সমাজ বিদ্যমান। গণতান্ত্রিক রাজনীতির বয়স বেশি দিনের নয়। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার পরে এ দেশে প্রকৃত শিল্পায়ন শুরু হয় এবং তখন থেকে ক্রমান্বয়ে এ দেশে বাঙালী শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে উঠতে শুরু করে। এ প্রেক্ষাপটে বলা যায়, এ দেশে শিল্পীয় সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সময় খুবই স্বল্প। ফলে, সুষ্ঠু শিল্প-সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ বাংলাদেশে সন্তোষজনক নয়। বাংলাদেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় বিদেশি সরাসরি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহে শিল্প-সম্পর্কের কিছু অনুকূল পরিবেশ দেখা যায়। তবে, এখনও পর্যন্ত সেখানে অবাধ টেড ইউনিয়ন গঠনের আইনগত সুযোগ নেই। বাংলাদেশে সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শিল্প-সম্পর্ক উপাদানগুলো বিদ্যমান আছে। তবে, ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকসংঘের দুর্নীতির কারণে সফল শিল্প-সম্পর্ক চলমান রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। যাহোক, এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য শিল্প-সম্পর্ক মডেল প্রস্তাব করা হলো। মডেলটি নিচে দেওয়া হলো। এই মডেলটি প্রস্তাব করার ক্ষেত্রে সালামন (২০০০) এবং ঘোষ ও রায় (২০১২) এর প্রদত্ত মডেলের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত মডেলে (নিচের চিত্র দেখুন) ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক পরিবেশগত উপাদান বিবেচনা করা হয়েছে। আমরা জানি, শিল্প-সম্পর্কের চালকগণের উপর ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক পরিবেশগত উপাদান প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প-সম্পর্কের চালক হিসেবে মালিকপক্ষ ও তাদের সমিতি , শ্রমিকপক্ষ ও তাদের ইউনিয়ন এবং সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো নেয়া হয়েছে। এদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী পাঁচটি সামষ্টিক পরিবেশগত উপাদান ও তাদের অন্তর্ভুক্ত প্রধান উপ-উপাদানগুলো মডেলে দেখানো হয়েছে।

আমরা জানি সামষ্টিক পরিবেশ হলো পরিবেশের ঐসব উপাদান যার উপর মালিক বা ব্যবস্থাপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তবে, কৌশল ব্যবহার করে কিছু মাত্রায় নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। যাহোক, শিল্প-সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলো হলো শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার অধিকার ও দরকষাকষির অধিকার, মালিক কর্তৃক

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, ইউনিয়ন সদস্যায়ন ও সংযুক্তি, দেশে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, দেশের সমাজে বিদ্যমান সামন্ত ব্যবস্থা বা শিল্প সমাজ ব্যবস্থা, উন্মুক্ত শ্রম চলাচলের সামাজিক অনুমোদন ইত্যাদি। সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলো ন্যূনপক্ষে বিদ্যমান থাকলে উন্নত শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখা যাবে।

আর একটি সামষ্টিক উপাদান হলো আইনগত পরিবেশ। এই আইনগত পরিবেশ অনুকূল থাকা উত্তম শিল্প-সম্পর্ক গড়ে ওঠা ও বজায় রাখার জন্য জরুরি। এই পরিবেশের মধ্যে দেশে বিদ্যমান শ্রম আইন ও বিধি, আইন পরিবর্তন, মালিক ও শ্রমিকের আইনগত অধিকার ও কর্তব্য এবং বিধি ও প্রক্রিয়া , আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মানবাধিকার বিধি ও তার প্রতিপালন জনিত অবস্থা ইত্যাদি আইনগত বিষয় যা শিল্প-সম্পর্ক গড়ে তোলা ও বজায় রাখার জন্য অবশ্য পালনীয়। বাংলাদেশে বর্তমানে বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩ চালু আছে। পাশাপাশি সাংবিধানিক নির্দেশনা ও কোর্টের রায় উদ্ভূত পালনীয় বিধান আছে। এগুলোই বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের আইনগত পরিবেশ গঠন করে।

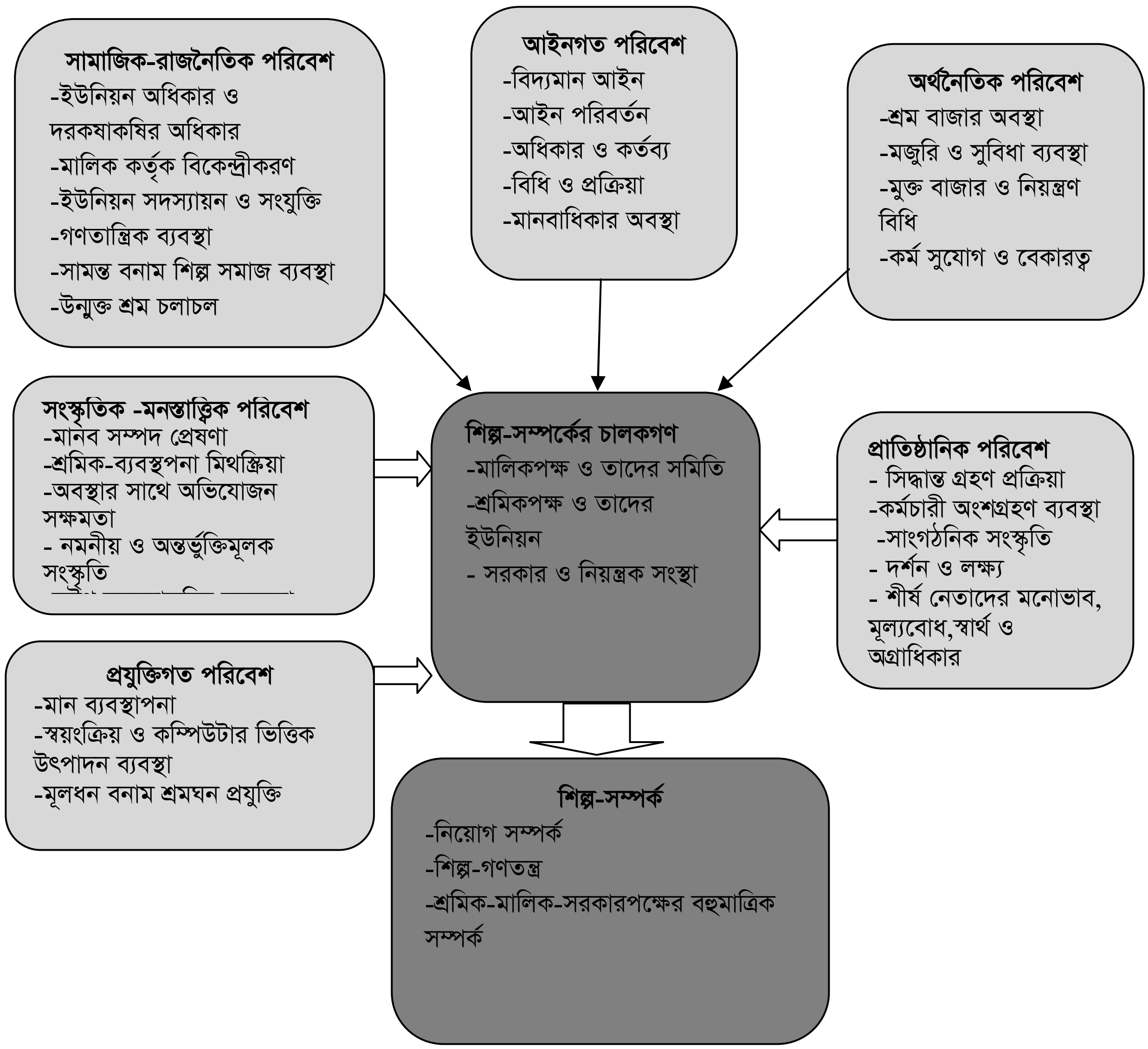

বাংলাদেশ শিল্প-সম্পর্কের প্রস্তাবিত মডেল

এই মডেলের আর একটি সামষ্টিক উপাদান হলো অর্থনৈতিক পরিবেশ। শিল্প-সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী উপাদান হলো অর্থনৈতিক পরিবেশ। কেননা, এটির সাথে শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবন জড়িত। এই অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে শ্রম বাজারের অবস্থা, মজুরি ও অন্যান্য আর্থিক ও ভৌত সুবিধার ব্যবস্থা, মুক্ত বাজার ও নিয়ন্ত্রণ বিধি, দেশের

কর্মসংস্থানের সুযোগ ও বেকারত্ব অবস্থা ইত্যাদি পড়ে। প্রতিষ্ঠানের মজুরি ও অন্যান্য আর্থিক ও ভৌত সুবিধার ব্যবস্থা শিল্প-সম্পর্কের শক্তিশালী নিয়ামক উপাদান। বাংলাদেশে সরকার সর্বনিম্ন মজুরি কতিপয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করে আইন করে দিয়েছে। সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সরকারি বেতন কাঠামো প্রযোজ্য। অন্যান্য শিল্পের জন্য কোনো মজুরি ব্যবস্থা নির্ধারিত নেই। এ ক্ষেত্রে শ্রম বাজারের অবস্থা, মুক্ত বাজার ও নিয়ন্ত্রণ বিধি, দেশের কর্মসংস্থানের সুযোগ ও বেকারত্ব অবস্থা ইত্যাদি শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে এবং মজুরি স্তর ওঠানামা করে। যাহোক, শিল্প-সম্পর্কের নিয়ামক শক্তি হিসেবে অর্থনৈতিক পরিবেশ কাজ করে।

এই মডেলের আর একটি সামষ্টিক উপাদান হলো সংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ যা শিল্প-সম্পর্কের চালকদের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। সংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের কার্য, ভৌত পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা পরিবেশ সম্পর্কে মনোজগৎ গঠন করে। এটি ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ, মনোভাব ও আচরণের ধরন নির্ধারণ করে। সংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের মধ্যে মানব সম্পদ প্রেষণা ব্যবস্থা, শ্রমিক -ব্যবস্থাপনা মিথস্ক্রিয়ার ধরন, পরিবেশগত অবস্থার সাথে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক-কর্মচারীদের অভিযোজন সক্ষমতা, নমনীয় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতি, শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির সক্ষমতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এ অবস্থা অনুকূলে থাকলে শিল্প-সম্পর্ক কাম্য মাত্রায় থাকবে।

এই মডেলের আর একটি সামষ্টিক উপাদান হলো প্রযুক্তিগত পরিবেশ। প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যবস্থাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে এবং একইভাবে শ্রমিক-কর্মচারীদের কার্য আচরণকে প্রভাবিত করে। প্রযুক্তিগত পরিবেশের মধ্যে মান ব্যবস্থাপনা চালু, স্বয়ংক্রিয় ও কম্পিউটার ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু, মূলধনঘন বা শ্রমঘন প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। স্মরণ রাখা দরকার যে, নতুন প্রযুক্তির কারণে শ্রমিক-কর্মচারীদের নতুনভাবে প্রশিক্ষণ নিতে হতে পারে, চাকুরির অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হতে পারে, মজুরি ও সুবিধার সংকট দেখা দিতে পারে ও শ্রমিকদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ সকল অবস্থা শিল্প-সম্পর্ক ভালো বা মন্দ করতে পারে। কেননা, প্রযুক্তিগত পরিবেশ শিল্প-সম্পর্কের চালকদের প্রভাবিত করে শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখে।

শিল্প-সম্পর্কের এই প্রস্তাবিত মডেলের ব্যষ্টিক পরিবেশগত উপাদান হলো প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ। ব্যষ্টিক পরিবেশ বলতে পরিবেশের ঐসব উপাদানসমূহকে বোঝায় যেগুলোর উপর মালিক বা ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ আছে। এই পরিবেশের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, কর্মচারী অংশগ্রহণ ব্যবস্থা, সাংগঠনিক সংস্কৃতি, প্রাতিষ্ঠানিক দর্শন ও লক্ষ্য, শীর্ষ নেতাদের মনোভাব, মূল্যবোধ,স্বার্থ ও অগ্রাধিকার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এগুলো মালিক বা ব্যবস্থাপনা চাইলে কমবেশি করে শিল্প-সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করা হয়। শিল্প-সম্পর্কের চালকগণ এই ব্যষ্টিক পরিবেশের উপাদানের নির্দেশনা মেনে শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখবে। এই চালকগণ আবার ব্যষ্টিক পরিবেশের উপাদানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করতে পারে। এভাবে চালকগণ শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখায় ভূমিকা রাখে।

সার্বিক বিচারে বলা যায়, শিল্প-সম্পর্ক হচ্ছে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক পরিবেশের একটা সামগ্রিক সমন্বিত ব্যবস্থা যার প্রভাব বলয়ে থেকে শিল্প-সম্পর্কের চালকগণ একটি প্রতিষ্ঠানে সন্তোষজনক শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যবস্থা করে, যেটি প্রস্তাবিত মডেলে প্রকাশ করা হয়েছে।

এবার আমরা বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করব।

বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের ভবিষ্যৎ

Future of Industrial Relations in Bangladesh

বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনার আগে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনগত ও প্রযুক্তিগত পরিবেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রস্তাবিত অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। কেননা, বাংলাদেশের অগ্রসরমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন আঙ্গিকে শিল্প-সম্পর্ক নবরূপ লাভ করতে যাচ্ছে। সে অবস্থার একটা রূপরেখা দিয়ে তারপর বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলব।

বাংলাদেশ: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা

বাংলাদেশে বর্তমানে স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাংবিধানিক চার মূলনীতি যথা: গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দেশ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের

দেশ। বাংলাদেশ ২০৩০ সালে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজ করছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্যের হার হবে শূন্য শতাংশ। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় হবে ৫ হাজার ৪৭৯ ডলারেরও বেশি। বর্তমানে (২০২০) মাথাপিছু আয় ২০১৯ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)' অর্জন, ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ এবং সর্বোপরি 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা' তথা ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৫৫ হাজার শিল্পকারখানা আছে এবং প্রায় ৭ কোটি ২০ লক্ষ শিল্প শ্রমিক সেগুলোতে কাজ করে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় দেশি-বিদেশি শিল্প কারখানায় ৫ লক্ষ ১৭ হাজার মানুষ কাজ করে। আরও ১০০ টি অর্থনৈতিক জোন তৈরির কাজ এগিয়ে যাচ্ছে, যা ২০২৫ সালের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় কাজ করবে। বাংলাদেশে বর্তমানে অবকাঠামো উন্নয়নে দেশের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো নয়টি বৃহৎ প্রকল্প (মেগা প্রজেক্ট) গ্রহণ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে–পদ্মাসেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, গভীর সমুদ্র বন্দর, ঢাকায় দ্রুত গণপরিবহণের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ, এলএনজি ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট, মহেশখালী-মাতারবাড়ি সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম, পায়রা সমুদ্র বন্দর, পদ্মাসেতু রেল সংযোগ এবং চট্টগ্রাম হতে কক্সবাজার পর্যন্ত ১২৯.৫ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপন। উপর্যুক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হলে দেশের জিডিপিতে ৪% যোগ হবে এবং জিডিপি দুই সংখ্যায় দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উন্নত রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, সুপেয় পানি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসা, মানসম্পন্ন শিক্ষা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি, কম্পিউটার ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ মানসম্পন্ন ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামকে আধুনিক শহরের সকল সুবিধাদি দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। গ্রামে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ আরও বাড়ানো ও নির্ভরযোগ্য করার লক্ষ্যে গ্রুপভিত্তিতে বায়োগ্যাস প্লান্ট ও সৌরশক্তি প্যানেল বসানোর উৎসাহ ও সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক সুরক্ষা স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে দেশের ইতিহাসে এই প্রথম 'বয়স্ক ভাতা', 'বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা ভাতা', 'অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতা', 'আশ্রয়ণ প্রকল্প', 'গৃহায়ন', 'আদর্শ গ্রাম',স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধুর সময় চালু হওয়া 'গুচ্ছগ্রাম' ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সত্যিকারের অসহায় হতদরিদ্র মানুষের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। এ ছাড়াও 'একটি বাড়ি একটি খামার','কর্মসংস্থান ব্যাংক'সহ আত্মকর্মসংস্থানমূলক বহুমুখী সৃজনশীল প্রকল্প ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আয়বর্ধক কর্মসৃজন, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাসম্প্রসারণ, নতুন বেতন স্কেল ও মহার্ঘ ভাতা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে মানুষের প্রকৃত আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ১১৯ উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, অতিরিক্ত ৩৮৯টি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপন করা হবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩২ টি হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৮ গুণ। গ্রাম পর্যায়ে কৃষিযন্ত্র সেবাকেন্দ্র, ওয়ার্কশপ স্থাপন করে যন্ত্রপাতি মেরামতসহ গ্রামীণ যান্ত্রিকীকরণ সেবা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে এবং এসবের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান করা হবে। অকৃষি খাতের এসব সেবার পাশাপাশি হালকা যন্ত্রপাতি তৈরি ও বাজারজাত করতে বেসরকারি খাতের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ, যা প্রায় ৫ কোটি ৩০ লাখ। 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রধানতম শক্তি প্রতিটি উপজেলায় 'যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' স্থাপন করা হচ্ছে। বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়ারপাশাপাশি এই কেন্দ্রগুলোকে পর্যায়ক্রমে 'তরুণ কর্মসংস্থান কেন্দ্র' হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দুটি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। 'কর্মঠ প্রকল্প'র অধীনে 'স্বল্প শিক্ষিত/স্বল্প দক্ষ/অদক্ষ' শ্রেণীর তরুণদের শ্রমঘন, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উপযোগী জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। 'সুদক্ষ প্রকল্প'র অধীনে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে যে ভারসাম্যহীনতা রয়েছে, তা দূর করতে নানামুখী কর্মসূচিগ্রহণ করা হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কার্যপরিচালনা করার জন্য সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ জনগণ যেন সহজে দাখিল করতে পারে, সেজন্য দেশের সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ‘অভিযোগ গ্রহণ বাক্স’ স্থাপন করা হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে আইনি ব্যবস্থার পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ জোরালো করা হয়েছে। ঘুষ, অনোপার্জিত আয়, কালো টাকা, চাঁদাবাজি, ঋণখেলাপি, টেন্ডারবাজি ও পেশিশক্তি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন, প্রত্যেক অফিসেই ইনোভেশন টিম গঠন, ই-ফাইল সিস্টেম, ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেম, ই-সার্ভিস রোডম্যাপ প্রণয়ন এবং জেলা-ব্র্যান্ডিং কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের ২৫ হাজার তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে। এ সব পদক্ষেপ সরকারকে আরও দায়বদ্ধ করবে।

বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্য সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০১৩, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫, শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। ৪৩ টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ৪০টি সেক্টরে শ্রমিকদের সম্মানজনক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনের ৬১ হাজার ৯৫ জন শ্রমিক ও কর্মচারীর বকেয়া মজুরি বা বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। শ্রমিকদের সন্তানের উচ্চ শিক্ষার জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে এ পর্যন্ত (২০২০) ২ হাজারের অধিক জনকে প্রায় ১৫ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা তথা পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে দুটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিশুশ্রম বন্ধের লক্ষ্যে শিশুদের শিক্ষা, বৃত্তি ও নানাবিধ সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ তৈরি পোশাক এবং চিংড়িসহ হিমায়িত মৎস্য শিল্পে শতভাগ শিশু শ্রম মুক্তকরণ এবং ৩৮টি সেক্টরকেঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করে এসব শিল্পে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কৃষি শ্রমিকদের শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩-এ শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূল ধারায় আনার জন্য প্রতিবন্ধী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন পাস করাহয়েছে। বর্তমানে (২০২০) ১০ লাখ প্রতিবন্ধী ভাতা এবং ৯০ হাজার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বৃত্তি পাচ্ছে। ইতিমধ্যে ১০৩ টি প্রতিবন্ধীসেবা ও সাহায্যকেন্দ্র চালু করা হয়েছে, যার উপকারভোগী ৪ লাখ ৭৬ হাজার ৬৪২ জন। ৮০ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা ঋণ ও অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সকল বিভাগীয় সদরে ১০ টি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়েছে। ১০০০ প্রতিবন্ধীকে কারিগরি, সেলাই, নাচ ও গান, চারু ও কারুকলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য ‘জব ফেয়ার’-এর আয়োজন করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায় শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, বয়স্কভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা, একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণপ্রকল্প, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, দুস্থ মাতাদের জন্য খাদ্য (ভিজিডি) সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ১৩০ টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১ কোটি ৭৬ লাখ ব্যক্তি বা পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের অধীনে তাদের বিশেষ ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে তাদের বিশেষ ভাতাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বেদে, হরিজন, দলিতসহ সকল গোষ্ঠীর মানুষকে উন্নত জীবন-জীবিকার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।

গ্রাম ও শহরের সামাজিকভাবে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর আবাসিক সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গরিব, বঞ্চিত, অবহেলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভাগীয় ও জেলা শহরে আবাসনসহ উপযুক্ত কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। তুলনামূলকভাবে অতি দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা (উত্তরাঞ্চল, উপকূলবর্তী এলাকা ও চরাঞ্চল, হাওড়, বাঁওড় প্রভৃতি)-সহ সারাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’ নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে ১২ লাখ মানুষের ৮০ দিনের কর্মসংস্থান করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে আরও লক্ষ্য ভিত্তিক ওসফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার খাতে মোট ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা

বর্তমান বাজেটের ৫.৬ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৩৪ শতাংশ। একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের আওতায় ৮৫ হাজার ৯৯৩টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করে প্রায় ৫৬ লাখ পরিবারকে উপকার ভোগী হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। তাদের জন্য নিজস্ব সঞ্চয় স্কিম সৃষ্টি করা হয়েছে, কল্যাণ অনুদান দেওয়া হয়েছে ও ২ হাজার ২৮ কোটি ৯৮ লাখ টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল প্রদান করা হয়েছে এবং সমিতিগুলো ২১৯ কোটি ৭৭ লাখ টাকা সেবা মূল্য আদায় হয়েছে। ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২ লাখ ৫২ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রায় ২ লাখ ১৫ হাজার পরিবারকে নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণের জন্য ১ লাখ টাকা করে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সার্বিক বিচারে বাংলাদেশ মানব সম্পদ উন্নয়ন ইনডেক্সে অনেক এগিয়ে গেছে ও যাচ্ছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ উজ্জ্বল সম্ভাবনার পথে অগ্রসরমান এক দেশ হিসেবে বিশ্বময় স্বীকৃতি পেয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশে সার্বিক গণতান্ত্রিক ও সামাজিক সুরক্ষার বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকবে বলে বাংলাদেশে উত্তম শিল্প-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। দায়িত্বশীল জনকল্যাণবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা শিল্প-সম্পর্ক ভালো করার প্রেক্ষিত তৈরি করবে। দেশের সামাজিক-সংস্কৃতিক অবস্থার অগ্রগতি সাধন হবে। শ্রমিকশ্রেণির আর্থসামাজিক অবস্থারও উন্নতি হবে। ফলে, মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ উভয়েই শিল্প-সম্পর্ক ভালো করার জন্য স্বতঃস্ফুর্ত হয়ে কাজ করবে।

শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদার পরিপূরণ হবে এবং তার প্রেক্ষাপটে তাদের মধ্যে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে, নিজেদের অধিকার নিজেরা বুঝে নিতে পারবে, অহেতুক রাজনীতিকরণ পরিত্যাগ করবে এবং শক্তিশালী শ্রমিকসংঘ গড়ে উঠবে। এ জন্য শ্রমিকশ্রেণি কার্যকর দরকষাকষি করতে পারবে ও সুষ্ঠু শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখার ভূমিকা রাখতে পারবে।

দেশের সার্বিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে এবং শতভাগ নাগরিক শিক্ষিত হবে। ফলে, শিল্পে শিক্ষিত শ্রমিক প্রবেশ করবে এবং তারা মানবিক, মার্জিত ও যৌক্তিক আচরণ করবে। তারা তাদের ন্যায্য হিস্যা যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করতে পারবে ও ন্যায়সংগত উপায়ে তা আদায় করতে পারবে। অযৌক্তিক শ্রম আচরণ আর দেখা যাবে না। শিল্পে সমঝোতামূলক গ্রহণযোগ্য কার্যপরিবেশ বজায় থাকবে ও সামাজিক ন্যায় বিচার ভিত্তিক শিল্প-সম্পর্ক বজায় থাকবে।

দেশের আর্থসামাজিক ও আইনগত পরিবেশের উন্নতির ফলে শিল্পের মালিকপক্ষও তাদের স্বৈরতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক,ও বুর্জোয়া নিপীড়নমূলক আচরণ পরিবর্তন করবে। মানবিক তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা চালু হবে। সামাজিক ক্ষমতার গ্রহণযোগ্য বণ্টন হবে। সমঝোতার ভিত্তিতে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ন্যায্য মজুরি ও অন্যান্য সুবিধাসমূহ নির্ধারণ হবে। সরকার সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এমতাবস্থায়, সুষ্ঠু ও মানবিক শিল্প-সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক সামগ্রিক বিচারে ভালো না। এই ভালো না থাকার কারণ হলো- মালিক ও শ্রমিক পারস্পরিক বিদ্বেষ, রাজনীতিকরণ, শক্তিশালী শ্রমিকসংঘের অভাব, শ্রমিকদের অনৈক্য, অপর্যাপ্ত মজুরি, মালিকপক্ষের স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা, ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্বাবধান, শ্রমিকদের শিক্ষার অভাব, চাকুরির নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি। এ সকল দুর্বলতা কাটানোর জন্য দরকার-মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও নীতিমালা প্রণয়ন ও অবহিতকরণ, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকরণ, শিল্প-গণতন্ত্র প্রবর্তনকরণ, সন্তোষজনক মজুরি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, অভিযোগ নিষ্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ, উপযুক্ত শ্রমিক নেতৃত্ব গড়ে তোলায় সহায়তাকরণ, মানবিক ও নিয়মতান্ত্রিক তত্ত্বাবধানকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থার প্রবর্তন। বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত একটি শিল্প-সম্পর্ক মডেল প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। মানব উন্নয়ন ইনডেক্সে বাংলাদেশ সব দিক দিয়েই এগিয়ে আছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। সে কারণে শিল্প-গণতন্ত্রের অনুকূল প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। সে জন্য বলা যায় বাংলাদেশে নিকট ভবিষ্যতে সুষ্ঠু শিল্প-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১। বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।
২। বাংলাদেশে দুর্বল শিল্প-সম্পর্কের কারণসমূহ বর্ণনা করুন।
৩। বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্ক উন্নয়নের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন।
৪। বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের প্রস্তাবিত মডেল বর্ণনা করুন।
৫। বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের ভবিষ্যৎ আলোচনা করুন।